Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Original Research

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র প্রবন্ধে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা

মনির হোসেন[১]*

[১] প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি), রংপুর ।

*** Corresponding Author:** মনির হোসেন; Email: monirhossainhossain2021@gmail.com; Mobile: +88**01760359627**.
Received: 31/10/ 2024; **Accepted**: 17/07/2024; **Online Available**: 10/08/2025.

Abstract

Serajul Islam Chowdhury (born June 23, 1936) is an important famous, powerful and discussed essayist of the twentieth century in modern Bengali literature. He is famous as a Bangladeshi thinker, writer, scholar and public intellectual; And he is a philosopher, educator and researcher all in one. The analysis of national and global society-politics-culture and literature in his writings and speeches attracts people strongly. He is involved in every issue of the country. Among the intellectuals he is also intellectual; He was a protestant voice against opportunism and an idealistic and progressive literary-cultural activist. This luminary pointed out the mistakes of the society and called for a change in the way of thinking. There is a modernity in his pure intellectual practice in writing; There is a contemporary mentality revolving around the cleanliness of history. All writing material is public and has a strong commitment to the public; And it's all political. have courage At heart there is a single world motherhood; The courage of this sense comes from the resolute courage of the struggle of the oppressed exploited in history. Absolutely is a visionary, a statesman, a man against tradition. A single word of his speech is as hard as a rock; His speech and writing may appear to be indifferent, simple, ruthless, but there is no limit to the intense desire of the deep struggle of the individual's heart in the writing Serajul Islam Chowdhury's inquisitive thoughts by deeply feeling the history in the person and the present person in the history; Dripta Khob, from that would join his growing protest campaign against the religious politics of the rulers over the religion of the state.

মূল শব্দ সূচক: *সামাজিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রিক জীবন, ধর্মীয় রাজনীতি, সেক্যুলারিজম, মানবিক মানুষ, বুর্জোয়া, বামপন্থী, জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রের প্রগতিশীলতা*

আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির কাছে ছিল অসহায়। প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য মন্ত্র, বিশ্বাস, জাদু টোনা বিশেষ করে 'পশু শিকারের জন্য পশুর সাহায্য লওয়ার চেষ্টা থেকে আদিম সমাজে ধর্মের উৎপত্তি [১]। তাদের সীমিত জ্ঞান, অসীম অজ্ঞতা, ভয়, বিস্ময়, অলৌকিক কল্পনা; 'দুর্বলের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্যে এবং সকলকে সংযত ও শৃঙ্খলিত রাখবার প্রয়োজনে কল্পিত হল ইহ-পরলোকে প্রসারিত জীবন-আত্মার অমরত্ব। আবার গোত্র ও সমাজ শাসনের প্রয়োজনে [২]' আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিন্নতার কারণে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিচিত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম শাস্ত্রের উদ্ভাবন ঘটেছে। কালক্রমে 'পৃথিবীর প্রধান হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিমধর্মগুলো বিভিন্ন স্থানে প্রসারণের সাথে সাথে নিজস্ব আলাদা একটা ভাষায় প্রসার; দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ, শস্য রোপণ বা ফসল কাটার সাথে নিজস্ব ভাষাভিত্তিক ধর্মীয় আলাদা আলাদা বৈচিত্র্যময় সব আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে [৩]। বস্তুত প্রাচীন ভারতবর্ষে অনার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আর্যরাই পাশ্চাত্য থেকে সর্বপ্রথম লিখিত ধর্ম গ্রন্থ বেদ নিয়ে আসে এবং এখানে প্রচলিত প্রাকৃত ধর্মগুলোকে গ্রাস করে আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় অনুশাসনের সর্বপ্রথম সূত্রপাত ঘটায়। রাজ্যশাসন এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে তাদের যোগযোগ ঘনিষ্ট হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে এই ধর্ম তথা বৈদিক ধর্ম ভারতবর্ষের স্থানীয় অনার্যদের ধর্মের ওপর নিজস্ব ছাপ এঁকে দিয়েছিল। কার্ল মার্কস লিখেছেন:

> ধর্মীয় জগৎটা হল বাস্তব জগতের বিপরীত। বাস্তব জগৎ অর্থাৎ যে সমাজের মূল ভিত্তি হল পণ্য উৎপাদন, বণ্টন; যেখানে সাধারণভাবে উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদন গুলোকে বিভিন্ন পণ্য আর মূল্য হিসেবে ধরে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে [৪]

অর্থাৎ উৎপাদন প্রণালির পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মও আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করে নিয়েছে। এবং মধ্যযুগে এর ভিত্তি ও প্রভাব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। যে সমাজের উৎপাদন কাঠামো যত শক্তিশালী; ঐ কাঠামোর সাথে বিশ্বাসপ্রবণ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর লোকাচার-আচরণও তত উৎসব মুখর। আবার চিরন্তন সত্য বা চিরস্থায়ী লোকাচার বলতেও প্রাচীন সভ্যতায় কোনও কিছু ছিল না। সমাজ ও উৎপাদন কাঠামো পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে মানুষের বিশ্বাস ভেঙেছে; ফলে লোকাচারগুলোও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আর এই ভাবেই ক্রিয়া-পতিক্রিয়ার দ্বান্দ্বিকতায় সামাজিক কাঠামোতে আবর্তিত নানাবিধ প্রথা, উৎসব আবহমান কাল ধরে সৃজন ও বর্জনে নিত্যনতুন বর্ধিতরূপ ধারণ করে চলছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংগঠিত রেনেসাঁ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের শিল্পবিপ্লব সমস্ত ধর্মীয় বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে যুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক মানবসভ্যতার সূচনা ঘটায়। আজকে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে আধুনিক দাবি করলেও পৃথিবীর অনেক দেশেই রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবন-প্রণালীতে বাহ্যিক আধুনিক; কিন্তু মননে পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কারবদ্ধ সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদরা সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করে চলেছেন। উনিশ'শ সাতচল্লিশের ভারতবর্ষ বিভক্তি এবং সমকালিন ভারত-বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাজনীতির কাঠামোগত চরিত্র আমাদের সন্নিকটে সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য দৃষ্টান্ত। উপরন্তু মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে ধর্মের ব্যবহার; বিশেষ করে আমাদের মতো 'অশিক্ষিত ও ধর্মভীরু মানুষের দেশে এতে করে সাম্প্রদায়িক শক্তিরই [৫]' লাভ হয়েছে বেশি। তাই সমাজে রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় 'ধর্মীয় রাজনীতির বিকাশ ঘটলে, সাম্প্রদায়িকতা প্রবল না হয়ে পারে না। যার জন্য 'ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের অভ্যাসটা পাকিস্তান আমলে কেটে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না, কেটে যায়ও নি, উল্টো বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তান রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি, উল্টো ধর্মকে কেন্দ্র করে সংগঠিত দাঙ্গায় [৬] বহু নিরপরাধ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতা লাভের পরও বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা শাসকগোষ্ঠী রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং পশ্চাৎপদতাকে উৎসাহিত করেছে নিজের স্বার্থে। ফলে আধুনিক রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবতাকেন্দ্রিক যে বোধের প্রয়োজন ছিল আমাদের দেশে তা প্রারম্ভে মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্পর্কে তিনি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন:

> ইউরোপে ধর্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাজ করিয়াছে। ধর্ম সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইলেও রাষ্ট্রের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। য়ুরোপীয় নেশনগণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মুখ্যত রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের দেশে মোগল-শাসন কালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট চেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ করিতে ভুলে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল [৭]। অথচ সত্যের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তাঁরই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ তাঁরাই ধর্ম। উপকরণের দিকে তার সিদ্ধি। অমৃতের দিকে সে বঞ্চিত এই অমৃতের আদর্শ মাপজোখের বাইরে [৮]।

অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় রেনেসাঁর কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন এর অবাধ বিকাশের ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ফলাফলস্বরূপ চার্চ শাসিত সমাজ-কাঠামো ভেঙে গিয়ে মানুষ শাসিত সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। বিপরীতক্রমে আমাদের দেশের মতো ইউরোপে তথা পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র ও ধর্ম কখনো আর একসাথে অঙ্গীভূত হয়নি। রাষ্ট্র যেহেতু ইহজাগতিক আর ধর্ম পরজাগতিক; তাই সেখানে রাষ্ট্রের বন্ধন থেকে ধর্মের যাবতীয় বন্ধন ও কার্যাবলী সম্পূর্ণ আলাদা। কেউ ইচ্ছে করলে ধর্ম পালন করতে পারে, আবার নাও পারে। রাষ্ট্র ধর্ম পালনে কাউকে জোর-জবরদস্তি করে না; রাষ্ট্র ধর্মকে উৎসাহিত করে না, বিকশিত হতেও সাহায্য করে না। রাষ্ট্রে ধর্মের ব্যবহার সেখানে পুরোপুরি আইন বিরোধী। প্রাবন্ধিক ড. আহমদ শরীফ ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বলেছেন:

> এভাবেই একটি আধুনিক রাষ্ট্রে জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস পেশা শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও সেক্যুলার গণতন্ত্রে অভিন্নমূল রশুনের মতো দৈশিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারে। কাজেই সেক্যুলারিজম অঙ্গীকার না করে সাম্প্রদায়িকতা নিরোধমূলক আন্দোলন

> যাওয়াই প্রয়াস থেকে যাবে। সেক্যুলারিজম মানে রাষ্ট্রে কোনো ধর্ম নেই। সরকারের কোন ধর্ম নেই। সরকার বিসমিল্লাহ্ বা শ্রীহরি বলে কোন কিছু শুরু করবে না। ঈদে বা পূজায় বাণী দেবে না, ঈদের জামাতে গিয়ে বক্তৃতা দিবে না। সেক্যুলারিজম মানে হচ্ছে ধর্মের অস্তিত্ব সরকারিভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকার করা। শুধু মানুষের সেবা করা, মর্ত্যজীবনের অভাব অভিযোগ ও দাবি মেটানো হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব। জাত, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে সম্মান জানাই হচ্ছে সেক্যুলারিজম [৯]।

বস্তুত সেক্যুলারিজম একটি ইহজাগতিক রাজনৈতিক মতবাদ। সেক্যুলারিজম অর্থই হলো-রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। রাষ্ট্র সবার, ধর্ম ব্যক্তিগত। এটা মানতেই হবে যে, আধুনিক জাতি রাষ্ট্রে ধর্মের যে মানবিক, উদারনীতি, ভ্রাতৃত্ব, মহানুভবতা, মজলুমের ন্যায্যতা, ন্যায় বিচারের অধিকার, খোদার কাছে সবাই সমান তথা সাম্য প্রভৃতি বিষয়গুলো সাংবিধানিকভাবে মানবসমাজে গৃহীত হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রে ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাস থাকতে পারে; আবার নাও থাকতে পারে। তা ব্যক্তির একান্ত স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি পরিচিত হবেন শুধুই একজন মানুষ হিসেবে। ব্যক্তি হবেন কুসংস্কার ভাব-প্রবণতা, উগ্রতা মুক্ত স্বচ্ছ মানবিক মানুষ। ব্যক্তির সমাজ ও রাষ্ট্রে তার আচার-আচরণে, রাষ্ট্রের বিবিধ কার্যক্রমে ব্যক্তির কোনোরকম ধর্মীয় অনুষঙ্গের প্রভাব থাকবে না। ব্যক্তি সমাজ নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হবেন নিজের জন্য, সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য। ব্যক্তি হবেন সমাজকেন্দ্রিক সব মানুষের জন্য। কিন্তু বাংলাদেশে যে উদ্দেশ্যের নিরিখে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হবার পরপর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল; তার বহির্ভূত নীতি সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ সেক্যুলারিজম শব্দের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এখানে প্রাকৃত ভাষার প্রবণতায় না গিয়ে বেদান্তিক ধারায় বর্ণিত হয়েছে মানুষের সামনে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের কাছে তা ব্যবহারিক অর্থের পার্থক্য কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেক্যুলারিজম শব্দের বাংলা করা যেতে পারতো "দুনিয়াদারি, ইহজাগতিক" চাহিদা মেটানোর রাষ্ট্রীয় কর্মকৌশল। তবে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলই; যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়েছে পূর্বে তাঁদের কেউ "ধর্মনিরপেক্ষতা" নীতি গ্রহণ করেনি। বাস্তবায়নে অগ্রসরও হয়নি। উপরন্তু, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা হয়েছে রাজনীতি ও ভোট ব্যাংক বৃদ্ধির নিমিত্তে। এরা প্রকাশ্যে, গোপনে ধর্ম ও ধর্মীয় মানুষকে সহযোগিতার নামে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ায়।

আবার এটাও সত্য যে, পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রই হাতে কলমে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। যে গ্রেট ব্রিটেনের কাছ থেকে আমরা আধুনিক গণতন্ত্রের ভাবধারা লাভ করেছি, তা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রধর্ম হল খ্রিষ্ট ধর্মের এ্যাঙ্গলিক্যান। যেখানে কোন ক্যাথলিকের বিলাতে রাজা হবার অধিকার নেই। ১৮২৮ সালের আগে রোমান ক্যাথলিকগণ বিলাতে সরকারি চাকরি করতে পারতেন না। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে পরিচিত সুইডেন বিশ্বের মধ্যে একটা অতি উন্নত দেশ। সুইডেন এর রাষ্ট্র ধর্ম হল লুথেরান গির্জা। রাজাকে সুইডেনে হতে হয় লুথেরীয় খ্রিষ্টীয় মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু বিলাত ও সুইডেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র না হলেও ধর্ম নিয়ে আগের মত কোন বিবাদ সেখানে আর টিকে নেই। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, ঐসব দেশের মানুষের মন সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। ইউরোপে মানুষের মনের উপর খ্রিষ্টধর্মের একটা বিরাট প্রভাব থাকলেও, গ্যালিলিও-র মত কাউকে এখন পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে বললে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় না। মানুষ সাধারণভাবেই হয়ে উঠেছে অনেক উদার। হয়ে উঠেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জ্ঞানে উপর অধিক শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারছে না; কারণ আমাদের মানুষ ও শাসকগোষ্ঠী মানসিক দিক থেকে এখনও আছে অনেক পিছিয়ে। তাছাড়া আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা এখনো পূর্ণাঙ্গ নয়; বরং ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা এখানে উল্টোভাবে বোঝানো হয়েছে। এক দল বুঝিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে নাস্তিকতা। এদেশে এই অংশের লোকেরা মূলত ব্যক্তিগত পর্যায়ের "নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের চর্চা" সর্বত্র প্রচার করতে সেক্যুলারিজম এর বেদান্তিক বাংলা শব্দের আশ্রয় নিয়েছে। অথচ রাষ্ট্রে বিশ্বাসী, অবিশ্বসী; নানা বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গঠিত। অন্যত্র আরেক দল জনগণকে বুঝিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে রাষ্ট্রের অনুকূলে, সাহায্য-সহযোগিতা ও কৃপায় সবার নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার। আর এভাবেই বাংলাদেশে ইনিয়ে বানিয়ে খুব চতুর ও সচেতনভাবেই রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতিতে ধর্মকে ডেকে এনেছে। ফলে বাংলাদেশে প্রতিবছরই সংগঠিত সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মবিদ্বেষ লোপ করা যাচ্ছে না; বরং দাঙ্গা,হাঙ্গামা চলমান- এই চিরন্তন সত্য অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রাবন্ধিক আবুল ফজল লিখেছেন:

> ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ জটিল কিছু নয়, ব্যাপারটা খুব সোজা, এ হচ্ছে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা। রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকবে না। কিন্তু রাষ্ট্র সেক্যুলার বলে কি আমি নামায পড়ব না? একশ বার পড়ব। আমি নামাজ পড়ব, আপনি পূজা করবেন, আপনার প্রতিবেশি নিয়মিত গির্জায়

> যাবেন। রাষ্ট্র নাক গলাবে না কোনো প্রকারে সেটাই হল ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়, কোনোমতেই। ধর্মের পক্ষে একটা বড় যুক্তি এই যে, ধর্ম মানুষের আত্মিক ক্ষুধা মিটায়। মানুষের আত্মার অথবা বলা যায় হৃদয়ের একটা ক্ষুধা আছে, সেই ক্ষুধার জন্য খাদ্য আবশ্যক। ধর্মের বাইরেও খাদ্য আছে, আছে দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পের নানাবিধ শাখায়, কিন্তু এই বিকল্প খাদ্যের আয়োজন না করতে পারলে ধর্মের এ দিককার মূল্য কমতে চাইবে না। সেজন্য প্রয়োজন ইহলোকিকতার [১০]। ধর্মের ওপর জোর দিতে গেলেই ঈশ্বরের আবির্ভাব অনিবার্য। আর ঈশ্বর মানে সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর-পশ্চিমের বেলায় জাতীয়। যে ধর্ম ইহকালে মানুষকে রক্ষা করতে পারেনি, পারছে না- সে ধর্ম পরকালে মানুষকে রক্ষা করবে এমন অলৌকিক বিশ্বাসে কেউ যদি স্বস্তিবোধ করেন তাতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই কিন্তু আমার আপত্তি হচ্ছে অলৌকিককে লৌকিক ব্যাপারে টেনে আনার। এর কোনো সামাজিক মূল্য নেই। এতে কোন সামাজিক তথা মানবীয় সমস্যার সমাধান হয় না [১১]।

অর্থাৎ রাষ্ট্রে ধর্মের উপর জোর দিতে গেলে সম্প্রদায়গত সর্বত্র কর্তৃত্ব করবে এবং এক পর্যায়ে দৃশ্যগতভাবে আর অদৃশ্যগতভাবেই হোক রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি চলে আসবে। অবশ্য এখানে আসার পেছনে খোদ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রচক্রের ষড়যন্ত্র আছে। মধ্যপ্রাচ্য রাষ্ট্রগুলো এর শিকার। যখন সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্র ব্যবসা নিম্নমুখী হয়, তখনই যুদ্ধের নিমিত্তে এরা বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের ভেতরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সংঘাত তৈরি করে যুদ্ধক্ষেত্র বানায়। রাষ্ট্র দখল করে। রাষ্ট্রে তখন ঘটে হিতের বিপরীত। জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িকতা সমাজে ঝেঁকে বসবে বা বসতে বাধ্য হয়। অরাজকতায় কলুষিত হয় সমাজ। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ ধর্মকে তাদের স্বাথে ততটুকুই ব্যবহার করে, যতটুকু করলে শোষণ ও কর্তৃত্ব রক্ষা করা যাবে।

তাছাড়া এই চর্চার বাইরেও মানুষের আলাদা একটা জাগতিক মন আছে। সেই মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে একমাত্র শিল্প-সাহিত্য। এই শিল্পচর্চার ভেতর দিয়েই মানুষের ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ সদা জাগ্রত হয়। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে স্বয়ং অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। তাই মানুষের জন্য, মানুষের বিকাশের জন্য, মঙ্গলের জন্য, ইহজাগতিক আনন্দ ও সমৃদ্ধির জন্য সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সেক্যুলারিজম রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান নিয়ামক হওয়া উচিত। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী এক জনসভায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রে *ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা* নীতি কি হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন:

> বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্মপালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করেব, খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। ধমের্র নামে লুট করা চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না [১২]।

বস্তুত, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামীলীগও পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলেও ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। অন্যত্র এটাও নিদারুণ সত্যাসত্য যে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং সাম্প্রদায়িকতা বন্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেবল আইন করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আবার সংবিধান দিয়ে কোনো একটা দেশের সমাজজীবনকে বিচার করতে গেলে বড় রকমের ভুল করতে হয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বলা হয়েছে, সব মানুষ সমান। কিন্তু সে দেশে কালো মানুষকে এখনও কুড়াতে হয় সাদা মানুষের ঘৃণা। ভোগ করতে হয় নানা প্রকার সামাজিক অসুবিধা। যদিও এই অসুবিধার পরিমাণ আগের তুলনায় এখন অনেক কমে এসছে। প্রতিবেশি রাষ্ট্র তথা ভারতের সব ধর্মের মানুষের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে সংবিধানে। বলা হয়েছে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে দেশের মুসলমানদের অবস্থা আমেরিকান নিগ্রোদের মতোই। মুসলমানরা সাধারণভাবে হিন্দুদের কাছে হয়ে আছেন ঘৃণার বস্তু। তা না হলে সাম্প্রতিককালে,রাম-বাবরী মসজিদ সমস্যা, হিন্দু-মুসলমানে রক্তক্ষয়ী সংঘাত সৃষ্টি হতে পারতো না। সাম্প্রতি সময়ে ‘ভারতে যা ঘটেছে, তা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, আইনের দিক থেকে যাই হোক, মনের দিক থেকে ভারত আদৌ একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ নয়। সেই বিবেচনায় আইন আর

দেশের বাস্তব অবস্থার মধ্যে যে ফারাক আছে তা অনেক' [১৩] ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতির বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমনটা সময়ে অসময়ে আমাদের দেশে সংখ্যালঘুর উপর আক্রমণ, মন্দির ভাঙ্গচুর করা, ধর্মীয় অনুভূতি উস্কে দেওয়া মামুলিক এতিহ্যগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অথচ ধর্মের প্রকৃত বাণী কখনোই মানবিকতা বিরোধী নয়। সংখ্যালঘু শব্দের ব্যবহারও রাজনৈতিক টার্ম। এ সম্প্রদায়ের উপর হামলা সংকীর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। তবে এই মোকাবেলাও রাজনেতিক ভাবেই করা উচিত। আর সেজন্য "ধর্মনিরপেক্ষতা" সবচেয়ে কার্যকরী কর্মকৌশল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্যা সমাধানের কাজটি কারা করবেন? এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সাংস্কৃতিক দল নাকি কোনো ব্যক্তি বিশেষ? কে আছেন? কারা আছেন? যদি বলেন মধ্যবিত্ত; তাহলে মধ্যবিত্তের কোন অংশ? আমরা আগেই বলেছি আমাদের এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি বিকশিত না। যে অংশটি বিকশিত তারাও পিছু টানের বদৌলতে বিদেশে পাড়ি জমায় কিংবা আতংক-গ্রস্থে থাকে। তথাকথিত দেশের মধ্যবিত্তের বড় অংশটি ভোগেন লোক দেখানো ধর্মচর্চায়। যারা কাজটি করতে চান তাঁদের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভোগেন ধর্মহীনতায় কিংবা ধর্ম বিরোধিতায়। ধনিক শ্রেণি এ ভূখণ্ডে কোনও কালেই ধর্ম পালন করেনি। ভোগ-বিলাসীতায় এরা মোঘল-ইংরেজ-পাকিস্তান সব আমলেই একই গোত্রধারী ছিল। সময়ের প্রয়োজনে তারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছ। বাস্তবিক অর্থে আমাদের দেশে রাজনীতিতে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার অত্যন্ত প্রকট। ফলে বাংলাদেশে শুধু ধর্মভিত্তিক দল নয়, সেক্যুলার রাজনৈতিক দলও রাজনৈতিক মাঠে ভোটের বেলায় নিজ স্বার্থে, দলীয় কর্ম-পরিকল্পনা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে ধর্মকে ব্যবহার করে আসছে। যদিও সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার যে চার মূলনীতির কথা বলা হয়েছে যথা: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সংবিধানের ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সমাজে সবার সম-অধিকার নিশ্চিত করা; তা কোনো রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্র পরিচালনায় এসবের কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। বরঞ্চ বিসমিল্লাহ বলে ধর্মের দোহাই দিয়েই তাঁরা তাদের রাজনৈতিক প্রচারণা আরম্ভ করেন। প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন:

> চরিত্রগত দিক দিয়ে বিএনপি, জামাত, হেফাজত, অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দল ও জাতীয় পার্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা এদের কর্মকাণ্ড দেখেছি। এর মধ্যে বিএনপি, জাতীয় পার্টি জন্ম হয়েছিলো সামরিক আমলাতন্ত্রের হাত ধরে সেনানিবাসে। উভয়ের নেতৃর্ত্বে ছিলেন দুই সাবেক সেনাপ্রধান। এরা জিয়াউর রহমান ও এরশাদ ক্ষমতায় পাকা পোক্তভাবে টিকে থাকার জন্য জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে যথেচ্ছ্যভাবে ব্যবহার করেছেন। সংবিধান ইচ্ছে মতো কেটেকুটে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পশ্চাৎপদকীকরণের দিকে ধাবিত করেছে। এই কার্যক্রম সেনানায়ক জিয়াউর রহমানের আমল থেকেই শুরু হয়েছে। নিজ চোখে এদের এসব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি [১৪]। অন্যাদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের স্থান আজ ততটুকুই প্রবল বামপন্থী আন্দোলন যতটা দুর্বল এবং সংস্কৃতিতে মধ্য–যুগের অন্ধকার যতটা গাঢ়। বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী না করে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শোষণ না করলে বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া থাকবে না; শোষণের ক্ষেত্রে ধর্ম তাদের হাতে অস্ত্র হয়ে চলে আসে। তদুপরি তাদের নিজেদের মধ্যে আছে নানাবিধ পিছুটান, আর আছে বিদেশী প্রভুদের আজ্ঞা পালন যারা সবাই ধর্মের পক্ষে, ধার্মিক বলে নয়, জনসাধারণ যাতে বিপ্লবী না হয়ে পড়ে সেজন্য ধর্মের আফিম খাওয়ানোর প্রয়োজন [১৫]।

অর্থাৎ প্রাবন্ধিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, সংবিধান এবং আইনে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি যে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে তার বিপরীতমুখী তথা সম্প্রদায়গত গোষ্ঠী পোষণ করে রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও ভোট নিংড়ানোর পরিস্থিতি স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই দৃশ্যগত। তার অন্যতম কারণ রাজনৈতিক দলগুলোই ভোটের মাঠে ভোট কেন্দ্রিক রাজনীতি করতে গিয়ে সংবিধান বর খেলাপ করছে। বাংলাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার (অপব্যবহার) করে। বিশেষ করে বিএনপি'র নির্বাচনের আগে প্রচারণায় থাকে ইসলাম রক্ষার নামে ভোটারদের কাছে ভোট চাওয়া। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অঞ্চলে তারা প্রচারণা চালায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশে ইসলাম থাকবে না। এর মূল অগ্রনায়ক বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর একমাত্র ভোটের রাজনীতিকে টার্গেট করেই সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করেছিলেন। তাঁরই দেখানো পথ ধরে সামরিক শাসক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন। এক সময় ভোটের আগে আওয়ামী লীগের একটি বহুল ব্যবহৃত স্লোগান ছিলো, "লা ই লাহা ইল্লালহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ"। তারাও অন্যদের মতো বলে যে, নৌকা নির্বাচিত হতে না পারলে সংখ্যালঘুরা দেশে থাকতে পারবে না। মোদ্দাকথা,

আমাদের সমাজে দৃশ্যগত কোনো "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব" না হবার কারণে এখানকার "ধর্মীয় ও সামন্তীয় সংস্কৃতি" রাজনৈতিক সংস্কৃতির চেয়ে শক্তিশালী। যদিও আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্লট-পরিবর্তন ঘটেছে দশকের পর দশক। কিন্তু সামাজিক কাঠামোর মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে খুবই কম। ফলস্বরূপ, আমাদের রাজনৈতিক দল, তাদের নেতাকর্মী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতিচর্চা, উন্নত চিন্তা-চেতনা, গুণগত শিক্ষা, পরমতসহিষ্ণুতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এবং নির্বাচনের পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে জনগণের কাছে নিজেদের মেন্ডেড ঠিক রাখার জন্য অসাম্প্রদায়িক হতে পারছে না। আবার আমাদের এখানে যাঁরা অসাম্প্রদায়িক বা প্রগতিশীল ধারার তথা বাম রাজনীতি করেন বা করেছেন; তাদের একটা বড় অংশ জাতীয়তাবাদী লুম্পেন বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি করেন কিংবা সুবিধাভোগী। আবার তাদের আন্দোলন ও জনগণকে সংগঠিত করে সঠিক রাজনৈতিক লাইনের মধ্যে না আসতে পারা আরও বড় সমস্যা। এদের মধ্যে যাদেরকে আমরা প্রকৃত বামপন্থী বলছি তাদের মধ্যেও আন্দোলন এর পদ্ধতি এবং সমাজ-কাঠামো নিয়ে সুষ্ঠু বিশ্লেষণ ও নিজেদের মধ্যে তত্ত্বগত মীমাংসায় শ্রেণিগত ঐক্য না হবার কারণে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে উপদলে, নানান ধারায়, মতবাদের লাইনে বিভক্তি ঘটে গেছে। যা বর্তমান বাংলাদেশে দৃশ্যমান। বরঞ্চ নাগরিকদের সাম্য, সমান অধিকার নিশ্চিত করাসহ সর্বোপরি বৈষম্যহীন নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে ইহজাগতিক কর্মপরিধির মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতা আসল চরিত্র খুঁজতে হবে। রাষ্ট্রের চোখে নাগরিকদের পরিচয় একটাই হবে যে, সে নাগরিক এবং সবার সাথে বৈষম্যহীনভাবে সমান অধিকারের নাগরিক। তাতে নিজস্ব আইডেনটিটি (যেমন ধর্মীয় বা ভাষা বা পাহাড়ি-সমতলী, নারী-পুরুষ প্রভৃতি) যাই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রীয় পরিচয় একটাই এবং একমাত্র পরিচয় সে রাষ্ট্রের নাগরিক। কাজেই মুখে অসাম্প্রদায়িকতার নামে সাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পড়ে সর্বত্র ঢোল পিটিয়ে *সেক্যুলারিজম আমার রাষ্ট্রীয় নীতি* এসব পুরোপুরি জনগণতন্ত্র বিরোধী। প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন:

> ধর্মনিরপেক্ষ বাংলায় প্রতিফলন হয় নাই তো, তখনই তো ১৯৭১ সালে মনে হচ্ছিল আমরা একটা নতুন জাতীয়তাবাদে যাচ্ছি সেটা ধর্মনিরপেক্ষ, ভাষাভিত্তিক। তারপরে তো ধর্মনিরপেক্ষতার মানে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা হলো না। ধর্মনিরপেক্ষতার মানেই দাঁড়াল সকল ধর্মের সমান অধিকার। এটা ধর্মনিরপেক্ষতা না। ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু সেটা হয় নাই। আওয়ামী লীগ সরকার এবং পরবর্তী সরকারগুলো তো ধর্মকে ব্যবহার করেছে। এরশাদ রাষ্ট্র ধর্ম পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে দুইটা কারণে একটা কারণ হচ্ছে যে, রাষ্ট্র, যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসছে তারা এটাকে ব্যবহার করছে ধর্মকে। ধর্মকে সরাসরি ব্যবহারই করেছে। আবার সাম্প্রদায়িক লোকদের সাথে আপোস করছে ভোটের জন্য। ব্যবহারও করছে, আবার আপোসও চালাচ্ছে। বিএনপি আপোস করে জামায়াতের সাথে। আওয়ামী লীগও আপোস করেছে এককালে জামাতের সাথে। করেছে হেফাজতের সাথে। এগুলো খুব মারাত্মক জিনিস [১৬]।

অর্থাৎ নাগরিকের ইহজাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করাই হবে রাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে নাগরিকরা রাষ্ট্রের এই কাজে সহযোগিতা করবেন। কিন্তু আমাদের দেশে যে বুর্জোয়া রাজনৈতিক গোষ্ঠী রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করে থাকে, এই বুর্জোয়া রাজনীতির মূল শেকড় তথা পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সমাজ; তাঁরা তাঁদের রাজনীতিতে ধর্মের বন্ধন একেবারে ছুঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের বুর্জোয়ারা এখানে তা করতে পারেনি। পারেনি তার কারণ বহুবিধ; কিন্তু যে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, স্বল্প মাইনের চাকুরীজীবী, নিম্নবিত্ত হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রকৃত বিশ্বাস পালন করুক আর না করুক; আল্লাহ, ভগবান, খোদা, ঈশ্বর, কালী, ভগবান শব্দের উচ্চারণ করা এগুলো মানুষের জীবনের পরিভাষা। এসব শব্দ চয়নে যারা সাম্প্রদায়িকতা খোঁজেন তারাই বড় সাম্প্রদায়িক।

পরিশেষে- ধর্ম হবে ব্যক্তির গোপন অঙ্গের গোপন ক্ষতের মতো। যা ব্যক্তি নিজে জানবে, বিশ্বাস করবে, মানবে, পালন করবে কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করাতে বা পালন করাতে উৎসাহ প্রদান করবে না, প্রচারণা চালাবে না, বাঁধা দিবে না। সেজন্য রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ইহজাগতিক মনোনিবেশে এই ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের সমাজের, রাষ্ট্রের প্রগতিশীল ও স্বচ্ছ মানুষেরা মিলেই এই সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমাদের রাষ্ট্রের প্রগতিশীল ও উদারবাদী মানুষরা সর্বদাই জনবিচ্ছিন্ন এবং খুবই আত্মকেন্দ্রিক। তারা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রেমবিলাসী হলেও বাস্তবিক কর্মে তাদের অবস্থান শূন্য। এ কারণেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হলেও এখানে রাষ্ট্র গঠনের "মৌলিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোগুলো" রাষ্ট্রিকভাবে গড়ে উঠেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো- মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ না হলে রাষ্ট্র কখনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয় না।

লেখকের অবদান

গবেষণার ধারণা ও কাঠামো প্রণয়নে গবেষক ও প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর উভয়েরই সমান অবদান রয়েছে। মনির হোসেন মূল গবেষণা ভাবনা, বিষয় নির্বাচন, প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তার উপরে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা, যুক্তি ও ব্যাখ্যা সমৃদ্ধকরণ, ভাষাগত ও পরিমার্জন এবং প্রবন্ধের চূড়ান্ত সম্পাদনা সম্পন্ন করেছেন গবেষক নিজেই। প্রবন্ধের চূড়ান্ত সংস্করণ গবেষক মনোযোগ সহকারে পাঠ ও অনুমোদন করেছেন এবং এর বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের যথার্থতার জন্য গবেষকের সাথে প্রাবন্ধিক যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কার্য সম্পাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ায় শ্রদ্ধেয় মযহারুল ইসলাম বাবলা ভাই এবং যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, যাঁদের একাডেমিক সহায়তা, গবেষণামুখী পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এই গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের সম্মানিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, যাঁরা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিল ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য সরবরাহে আন্তরিক সহায়তা করেছেন। পরিশেষে, প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র অমর সাহিত্যকর্ম, রাষ্ট্র-জনগণ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও তাঁর সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এই গবেষণার প্রেরণার মূল উৎস। তাঁর সমাজ-রাষ্ট্র বিষয়ক ভাবনা, সাহিত্যচর্চা ও সৃষ্টিশীল শক্তি সকল গবেষক, রাজনীতিবিদ, পাঠক এবং সাহিত্যপ্রেমীরা অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ নির্মাণে বদ্ধপরিকর হবেন–এই আশা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করছি।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব

এই গবেষণা প্রবন্ধ "**সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র প্রবন্ধে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা**" এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের আর্থিক, সামাজিক সংগঠন; পেশাগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনোরকম দ্বন্দ্ব নেই। তবে রাষ্ট্রিক পরিচালনায় কাঠামোগত পরিবর্তনে অবিশ্বাসী, ডানপন্থা মতাদর্শ ও প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী নয়; এমন সব দল, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। বামপন্থী, প্রগতিশীল, লিবারেল ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোয় বিশ্বাসী দল এবং মানুষের সাথে দ্বন্দ্ব নেই।

তথ্যনির্দেশ:

১. রেবতী বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.২৯
২. আহমদ শরীফ, *বিচিত চিন্তা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ.২০৩
৩. কে. বি.সাজ্জাদুর রশীদ, *সাংস্কৃতিক ভূগোল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১০৫
৪. প্রগতি প্রকাশন (অনূ.), *ধর্ম প্রসঙ্গে*, মস্কো, ১৯৮১, পৃ. ১৩৪
৫. শহিদুল ইসলাম, *সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্র রাজনীতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৬৬
৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *উত্তরাধিকারের অনিবার্য প্রশ্ন*, অবসর,ঢাকা,২০১৬, পৃ. ৪৬
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩১৪, পৃ.৮৫-৮৬
৮. ঐ, *মানুষের ধর্ম*, বুক ক্লাব, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫
৯. আহমদ শরীফ, *বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা,২০০০, পৃ. ৬৩, ১০৮
১০. বাংলাদেশ লেখক শিবির (সম্পা.), *মুক্তধারা, ঢাকা*, ১৯৭৫, পৃ. ২৩-৩২
১১. আবুল ফজল, *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন*, বইঘর, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ.৩২৯-৩৩৪
১২. উদ্বৃত, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.), *নতুন দিগন্ত*, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা,২০১০, পৃ. ৫৩
১৩. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, মজিদ পাবলিকেশন ঢাকা, ২০০৩,পৃ.৪০-৪১
১৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র সঙ্গে *সাক্ষাৎকার*, দোসরা জানুয়ারী, ২০২২, সময়:১১-১২টা, টিএসসিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বেকনের মৌমাছিরা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৬৩
১৬. সাক্ষাৎকার, তদেব।